মহাকবি কালিদাসকৃতম্

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্

[বর্তমান সংস্করণে রয়েছে—ভূমিকা, মূল, প্রাকৃতানুবাদ, সন্ধিবিচ্ছেদ, অন্বয়, বাঙ্‌লা শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ, বিধূভূষণ গোস্বামীকৃত 'সরলা' টীকা (প্রতি অংকের শেষে), মনোরমা (ব্যাকরণগত আলোচনা), আশা (বিবিধ টীকা সংকলন), আলোচনা, বিষয়মুখী প্রশ্নোত্তর, সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা ভাষায় ব্যাখ্যা, ভাবসম্প্রসারণ, প্রশ্নোত্তর, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদি]

অনুবাদ ও সম্পাদনা—

ডঃ অনিলচন্দ্র বসু, এম. এ. (ডবল) পিএইচ্. ডি. কাব্যব্যাকরণতীর্থ,

(অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

স্বপ্নবাসবদত্তম্, ভট্টিকাব্যম্ (দ্বিতীয়সর্গ), মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়), যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা (ব্যবহারাধ্যায়), কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তিঃ, নলচম্পূ, প্রবোধচন্দ্রোদয়ম্, উচ্চমাধ্যমিক সংস্কৃত সহায়িকা ও দশরূপকম্ (সম্পূর্ণ)

গ্রন্থের সম্পাদক ও রচয়িতা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাম্মানিক স্নাতক সংস্কৃতের ভূতপূর্ব পরীক্ষক, স্নাতক বোর্ড অব্ স্টাডিজ (সংস্কৃত)-এর ভূতপূর্ব সদস্য, আকাশবাণী, কলকাতার সংস্কৃত শিক্ষার ভূতপূর্ব আসর পরিচালক।

সংস্কৃত বুক ডিপো

২৮/১, বিধান সরণী,

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

Scanned by CamScanner

(১২) "কালিদাসের দৃষ্টিতে প্রকৃতি"

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে প্রকৃতি একটা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রায় সকল কবির রচনায় প্রকৃতির বর্ণনা অল্পবিস্তর থাকলেও, কালিদাসের রচনায় প্রকৃতি যেরূপ প্রধান ও অপরিহার্য অংশগ্রহণ করেছে সেরূপ অন্যকোন কবির রচনায় দুর্লভ। ইংরেজী সাহিত্যেও প্রকৃতির কবি বিরল নয়, কিন্তু যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে মহাকবি কালিদাস প্রকৃতিকে দেখেছেন, ইংরেজী সাহিত্যের খ্যাতনামা কবিগণের দৃষ্টিভঙ্গী তা থেকে স্বতন্ত্র। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স্ প্রভৃতি কবিগণের কেউ প্রকৃতির মধ্যে অনুসন্ধান করেছেন একটা উচ্চতর নৈতিক আদর্শ, কেউ বা একটা বস্তুনিরপেক্ষ আদর্শবাদ, আবার কেউ বা একটা সৌন্দর্য সম্ভোগের প্রেরণা।

কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কাছে প্রকৃতি ছিল একটা পৃথকসত্তা, একটা পৃথক্ ব্যক্তিত্ব, যা মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ছোটবড় সকল ঘটনার সঙ্গে একান্তভাবে সংশ্লিষ্ট। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতি এমন এক নিবিড় ও মধুর সম্বন্ধ মহাকবি কালিদাস ব্যতীত অন্য কোন কবি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা তা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের বিচিত্র ঘটনা ও ভাবপ্রকাশকে মুক্ত করে দেখা কালিদাসের কবিচিত্তেরই একটা ধর্ম। মানুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে তিনি অদ্ভুত সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন এবং সে বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয় ও অনুপম। কালিদাসকে সাধারণতঃ প্রাচ্যের শেক্‌সপীয়র বলা হয়। কিন্তু এ বিষয়ে প্রাচ্যের কবি পাশ্চাত্যের কবি থেকে উচ্চতর আসন পাবার যোগ্য বললেও অত্যুক্তি হয়না। প্রকৃতির প্রতি অনুরাগ থাকা সত্ত্বেও শেক্‌সপীয়র প্রধানতঃ মানুষের মনের কবি, আর কালিদাস মানবচিত্তের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সুদক্ষ হয়েও প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি।

মহাকবি রচিত 'ঋতুসংহার" গীতকাব্যে প্রকৃতি কেবল উদ্দীপনরূপে চিত্রিত হয়নি, আলম্বনরূপে তার বর্ণনা এ কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। মালবিকাগ্নিমিত্রম্ দৃশ্যকাব্যে মহাকবি কমনীয়কলেবর মালবিকাকে প্রকৃতিদেবীর প্রতিমূর্তি রূপে কল্পনা করে সন্নিবিষ্ট করেছেন। 'কুমারসম্ভবম্' মহাকাব্যে প্রকৃতিত নয়া উমার জন্মস্থান হিমালয়কে হৃদ্য বর্ণনার মাধ্যমে নিজের কাব্যের মানদণ্ড রূপে বিদ্বদ্ মণ্ডলীর সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। "বিক্রমোর্বশীয়ম্" দৃশ্যকাব্যে প্রকৃতি হেমকূটপর্বতের রাজোদ্যান ইত্যাদিতে অপ্সরার রূপ পরিগ্রহ করে উপস্থিত হয়েছে। "মেঘদূতম্" গীতিকাব্য বস্তুতঃ প্রকৃতিরই কাব্য। ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও বায়ুর সন্নিপাতে সৃষ্ট মেঘ বিরহী যক্ষের সহৃদয় বন্ধুর মত বার্তাবহের ভূমিকা গ্রহণ করেছে। "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে প্রকৃতি যেরূপ প্রাধান্য পেয়েছে, সেরূপ অন্য কোন রচনায় পায়নি। প্রকৃতির অঙ্গভূত চেতন-অচেতন সকল কিছুই এখানে মহাকবির লেখনীস্পর্শে কেবল যে মানবজগতের সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভ

Scanned by CamScanner

করেছে তা' নয়, পরন্তু পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি নিজের নিজের স্বভাব রক্ষা করেও মানুষের সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। বস্তুতঃ এ নাটকে অন্যান্য চরিত্রের মত প্রকৃতিরও যে একটা বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে তা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায়না।

"ঋতুসংহার" গীতি কাব্যে ছয়ঋতুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের উপর এদের প্রভাব কতটুকু তা' সবিস্তারে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষতঃ প্রেমিক প্রেমিকার হৃদয়বৃত্তিতে ছয়ঋতুর পরিবর্তন যে ভাববৈচিত্র্য আনে তা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক করে বর্ণনা করা হয়েছে এ গীতিকাব্যে। বসন্তঋতুর বর্ণনায় একটি শ্লোকে বলা হয়েছে,— **"প্রফুল্লচূতাংকুরতীক্ষ্ণসায়কো দ্বিরেফমালা বিলসদ্ ধনুর্গুণঃ।**
মনাংসি ভেত্তুং সুরতপ্রসঙ্গিনাং বসন্তযোধঃ সমুপাগতঃ প্রিয়ে ॥"

অর্থাৎ **"আসিল বসন্তঋতু সময়ের সাজে, প্রেমিকমানসে তার তীক্ষ্ণ শরবাজে।**
বিকসিত চূতাংকুর মাধবের বাণ, ধনুর্গুণ তাঁর হয় ভ্রমরবিতান ॥

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)

প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় ঋতুসংহার কাব্যের প্রাকৃতিক বর্ণনার মধ্যে পাওয়া গেলেও, কালিদাস কাব্যের প্রাণ "ব্যঞ্জনা" এখানে নিতান্তই বিরল।

মহাকবি রচিত "মেঘদূত" গীতিকাব্য তো বর্ষারই কাব্য। 'আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" নববর্ষার আবির্ভাবে ধরণীর চারদিকে যে পরিবর্তন ঘটে তা' দেখে মানুষের মন চঞ্চল ও সচেতন হয়ে উঠে। ধরনীর বুকে অবিরল ধারায় বারিবর্ষণ আর আকাশে কালো মেঘের খেলা দেখে সুখী ব্যক্তিরাও উদাস, আন্‌মনা হয়ে উঠে। বিরহীদের তো কথাই নেই। তাই মহাকবি বলেছেন,—**"মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপি অন্যথাবৃত্তিশ্চেতঃ"** ইত্যাদি। প্রিয়ামিলনের জন্য বিরহীদের মন এমনি ব্যাকুল ও কাতর হয় যে, তখন তাদের কাছে চেতন-অচেতন পদার্থের মধ্যে পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়না। **"কামার্তা হি প্রকৃতিকৃপণাঃ চেতনাচেতনেষু"**। বলাবাহুল্য, এ কাব্যের প্রকৃতি রঙ্গশালার সঙ্গে তুলনীয়। রঙ্গশালায় উপবেশন করে দর্শক যেমন বিচিত্র ও বিবিধ দৃশ্য দর্শন করে, তেমনি এ কাব্যেও সহৃদয় পাঠক নিজের সম্মুখে প্রকৃতির বহু চিত্তাকর্ষক নব নব রূপ দেখতে পারেন। এগুলির মধ্য দিয়ে কবির প্রকৃতির প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ ও চিত্রণকৌশল প্রকটিত হয়েছে।

মহাকবি তাঁর "কুমারসম্ভবম্" মহাকাব্যে অতুল ঐশ্বর্য ও বিরাট মহত্ত্বের প্রতীক দেবতাত্মা, পৃথিবীর ভারসাম্যরক্ষাকারী মানদণ্ডস্বরূপ গিরিরাজ হিমালয়ের গৌরবোজ্জ্বল বর্ণনা দিয়ে আরম্ভ করেছেন। হিমালয়ের শান্ত, সংযত প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে

Scanned by CamScanner

যোগীশ্বর শঙ্কর ধ্যানাসীন। প্রকৃতিও নিশ্চল নিষ্পন্দ হয়ে রুদ্ধশ্বাসে হিমালয়ের তপোবনের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত। মদন সমভিব্যাহারে অকালবসন্তের আকস্মিক সমাগমে প্রকৃতিতে দেখা দিল আনন্দের হিল্লোল আর সঙ্গে সঙ্গে গিরিরাজ তনয়ার মনে জাগল প্রণয়ের আবেগ, উদ্‌গম হল তার গৌরবের পুলক। অসামান্য রূপের গর্ব নিয়ে পার্বতী শঙ্করের চরণপ্রান্তে উপস্থিত হলে, ফল হল বিপরীত। মহেশ্বরের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হল মদন এবং পার্বতী নিজের রূপকে ধিক্কার দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। বিষাদের ম্লান ছায়ায় আশ্রম পরিবেশও মলিন হয়ে উঠল। এ মহাকাব্যের প্রথমসর্গে হিমালয় বর্ণনায়—**"দিবাকরাদ্ রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্"** (অর্থাৎ যিনি দিবাভীত অন্ধকারকে নিজের গুহামধ্যে আশ্রয় দিয়ে সূর্য থেকে রক্ষা করেন), কিংবা **"যঃ পূরয়ন কীচকরন্ধ্রভাগান্ দরীমুখোত্থেন সমীরণেন"**, (অর্থাৎ গুহানির্গত মারুতফুৎকারে যিনি বংশছিদ্রগুলিকে বাঁশীরূপে বাজিয়ে থাকেন) ইত্যাদি শ্লোকে হিমালয় পর্বতের সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে।

'রঘুবংশম্' মহাকাব্যে মহাকবি মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রীতি ও সহৃদয়তার মনোরম সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। রঘু, রামচন্দ্র ও তাঁর অনুজগণের জন্মগ্রহণ কালে কেবল যে, রাজপ্রাসাদের অধিবাসী ও রাজ্যের প্রজাবৃন্দ হর্ষোৎফুল্ল হয়েছে তা' নয়, প্রকৃতির মধ্যেও তখন আনন্দের বন্যা বয়ে গেছে। আকাশ হয়েছে নির্মল, সূর্য মৃদুকিরণ বিকিরণ করেছে, এবং মন্দ মন্দ প্রবাহিত হয়েছে সুগন্ধ পবন। অন্যত্র সীতা যখন দ্বিতীয়বার রামচন্দ্র কর্তৃক নির্বাসিতা হলেন, তখন তাঁর মর্মান্তিক দুঃখে প্রকৃতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করেছে।

"নৃত্যং ময়ূরাঃ কুসুমানি বৃক্ষাঃ
দর্ভানুপাত্তান্ বিজহুর্হরিণ্যঃ।
তস্যাঃ প্রপন্নে সমদুঃখ ভাবম্
অত্যন্তমাসীদ্ রুদিতং বনেঽপি ॥"

অর্থাৎ ময়ূরগণ নৃত্য পরিত্যাগ করেছে, বৃক্ষসকল ত্যাগ করেছে কুসুম সম্ভার, আর মুখের তৃণ ত্যাগ করেছে হরিণীরা। সীতাকে হারিয়ে রামচন্দ্র যখন বনে বনে তাঁকে খুঁজে ফিরছিলেন, তখন বনের বৃক্ষগুলি শাখা আনত করে রামচন্দ্রের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে। এ মহাকাব্যের চতুর্দশ সর্গে দেখা যায়, লক্ষ্মণ সীতাকে নির্বাসনার্থে নিয়ে যাবার সময় গঙ্গা যেন তাঁর তরঙ্গরূপ হস্ত উত্তোলন করে লক্ষ্মণকে এরূপ নিষ্ঠুরকার্য সম্পাদন করতে বারণ করলেন,—**"অবার্য্যতেবোত্থিত বীচিহস্তৈর্জহ্নোর্দুহিস্ত্র স্থিতয়া পুরস্তাৎ ॥"**

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের প্রথম চার অংকের ঘটনা মহর্ষি কণ্বের আশ্রমের প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এ নাটকের আখ্যানভাগ প্রকৃতির

Scanned by CamScanner

ক্রোড়েই বিকাশ লাভ করেছে। মালিনী নদীর তীরে অবস্থিত কুলপতি কণ্বের আশ্রম। এ আশ্রমের বৃক্ষতলে শুকঅধ্যুষিত বৃক্ষকোটর থেকে ভ্রষ্ট নীবারধান্যের কণা বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে। এখানে নির্ভয়ে হরিণেরা বিচরণ করে, মানুষের প্রতি বিশ্বাসবশতঃ এরা রথ দেখে পলায়ন করেনা, ইঙ্গুদীফল ভাঙার জন্য ব্যবহৃত তৈলাক্ত ও মসৃণ প্রস্তরখণ্ড এখানে বিরলদৃষ্ট নয়। এখানে আশ্রমের পথরেখা ঋষিদের সিক্ত বল্কলবসন থেকে চ্যুত বারিধারায় চিহ্নিত রয়েছে। এ আশ্রমেরই শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম পরিবেশে নায়িকা শকুন্তলা প্রকৃতিতনয়ার মত তপোবনপ্রকৃতি কর্তৃক অসীম স্নেহ ও যত্নে লালিতা ও রক্ষিতা হয়েছে। তপোবনবালা শকুন্তলাও তেমনি **"অস্তি সোদরস্নেহঃ অপি এতেষু"**,—আশ্রমের তরুলতা, পশু, পক্ষী সকলের প্রতি সোদরস্নেহ পোষণ করে। মানুষের আদর পাবার বাসনায় এখানে কেসরবৃক্ষ যেন শকুন্তলাকে ইসারায় ডাকে। শকুন্তলার হৃদয়লতিকা এখানে চেতন-অচেতন সকল কিছুকে স্নেহের ললিতবেষ্টনে আবদ্ধ করে রেখেছে। সে নবকুসুমযৌবনা বনজ্যোৎস্নাকে স্নিগ্ধদৃষ্টি দিয়ে হৃদয়ে গ্রহণ করেছে।

প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহের বর্ণনায়ও মহাকবি অদ্ভুত কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। যেমন প্রথম অংকে রাজার ধনু থেকে শরপতনের ভয়ে পলায়মান মৃগের বর্ণনা এত নিখুঁত ও বাস্তব হয়েছে যে, **"গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে দত্তদৃষ্টিঃ"** ইত্যাদি শ্লোকটি পাঠ করলেই সহৃদয় পাঠকের সম্মুখে যেন চিত্রটি তৎক্ষণাৎ ভেসে উঠে।" কিবা চারু গ্রীবাভঙ্গে ফিরে ফিরে চায় / একদৃষ্টে মুহুর্মুহুঃ রথটির বাগে / শরপাতভয়ে তার আকুঞ্চিতকায় / পশ্চাতের দেহ যেন পশে পূর্বভাগে / শ্রমে আধো খোলা মুখ ঝরি তাহা হতে / অর্ধেক চর্বিততৃণ পড়ে পথে পথে / কি দীর্ঘ দিতেছে লম্ফ মনে হয় তায় / ব্যোমমার্গে গতি তার অল্পই ধরায় /" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)। মৃগয়াসক্ত রাজাকে লক্ষ্য করে—**"ভো ভো রাজন্, আশ্রমমৃগোহয়ং ন হন্তব্যঃ ন হন্তব্যঃ"** ইত্যাদি যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছিল, সে সতর্কবাণীর দ্বারা আশ্রমমৃগের সঙ্গে শকুন্তলাকে করুণার আচ্ছাদনে আচ্ছন্ন করে রাখার কথাও বলা হয়েছিল। কারণ, "দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ"। এইটি সমস্ত তপোভূমির ক্রন্দন। সে তপোবন প্রাণীদের মধ্যে শকুন্তলাও একটি। সকল প্রাণী রক্ষিত হলেও শকুন্তলাকে রক্ষা করা গেলনা।

দ্বিতীয় অংকে রাজার বয়স্য মাধব্যের অনুরোধে মৃগয়া একদিনের জন্য স্থগিত থাকলে, সে অবসরে বন্যপ্রাণীদের নির্ভয়ে সেদিনটি যাপনের দৃশ্যটি অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্তরূপে প্রকট হয়েছে,—"গাহন্তাং মহিষাঃ নিপানসলিলং শৃঙ্গৈর্মুহুস্তাড়িতম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ—"পশুক মহিষদল পঙ্কিল পল্টবলে/ শৃঙ্গ দিয়া মুহুর্মুহুঃ আলোড়িয়া জল / করুক রোমন্থ সুখে মৃগ দলে দলে / অরণ্যের শান্তিময় লভি ছায়াতল / করুক বরাহবৃন্দ

Scanned by CamScanner

পল্টবলমন্থন / প্রচুর মুথার মূল করি উৎপাটন / আজ এই ধনু মোর লভুক বিশ্রাম / শিথিল হউক. ছিলা তূণশায়ী বাণ / (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)।

তৃতীয় অংকের ঘটনাও মহর্ষি কণ্বের তপোবনের প্রাকতিক পরিবেশেই সংঘটিত হয়েছে। মালিনী নদীর তীরস্থিত বেতসকুঞ্জের কুসুমশয্যাসীনা শিলাতলে মদনতাপক্লিষ্টা শকুন্তলা শায়িতা। শকুন্তলার তাপ উপশমের জন্য প্রিয়ংবদা নিয়ে আসেন উশীরলেপন ও সনালননলিনীপত্র। গৌতমী নিয়ে আসেন শান্তিবারি। অনসূয়া তাঁকে পদ্মপত্রের বাতাস দিতে ব্যস্ত। রাজা ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে লতাকুঞ্জসমীপে এসে প্রভাতকালীন চন্দ্রকলার ন্যায় শীর্ণা পাণ্ডুবর্ণা শকুন্তলাকে শায়িতা দেখলেন। রাজার সঙ্গে শকুন্তলার ঘনিষ্ঠ মিলনের সুযোগ করে দেয় শকুন্তলার সখী দ্বয়।

তপোবনের সঙ্গে শকুন্তলার এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্পর্ক, এমন প্রীতি ও কল্যাণের বন্ধন ছিল যে, চতুর্থ অংকে দেখি, পতিগৃহযাত্রাকালে বনদেবতারা তার পিতার ঘনিষ্ঠ কুটুম্বের মত শকুন্তলাকে মণ্ডনের জন্য বসনভূষণ, অলক্তক ইত্যাদি উপহার দিতে ভোলেনি। আশ্রমের সকল চেতন-অচেতন পদার্থনিচয়ের প্রতি শকুন্তলার এমন নিবিড় ও মধুর প্রীতির সম্পর্ক ছিল যে, আশ্রমের বৃক্ষসমূহের আলরালে জলসেচন না করে সে কখনো নিজে জলপান করত না, ভূষণপ্রিয়া হয়েও সে স্নেহবশতঃ কখনো তাদের নবকিসলয় ছেদন করত না, তরুলতার প্রথম পুষ্পোদ্‌গম হলে সে তখন উৎসবে মত্ত হত।—**"পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলম্"** ইত্যাদি। মহর্ষি যখন স্বজনতুল্য আশ্রমপ্রকৃতির অঙ্গভূত বৃক্ষলতাদির কাছ থেকে পতিগৃহযাত্রার অনুমতি চাইলেন, তখন কোকিলের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে তা' তৎক্ষণাৎ পাওয়া গেল।

শকুন্তলা প্রিয়ংবদাকে যখন বলল, আর্যপুত্রকে দেখবার জন্য আমার প্রাণ আঁকুল হলেও, আশ্রম ছেড়ে যেতে আমার পা যেন উঠছে না, তখন উত্তরে প্রিয়ংবদাও বলল, তুমিই যে কেবল তপোবনের বিরহে কাতর তা নয়, তোমার আসন্ন বিয়োগে তপোবনেরও সেই একই দশা।—"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ, ময়ূর নাচে না আর। খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে, যেন সে আঁখি জলধার ॥" (রবীন্দ্রনাথ)। পথ চলতে চলতে হঠাৎ বাধা পেয়ে শকুন্তলা যখন বলল,—**"কো নু খলু এষ নিবসনে সজ্জতে?"** "আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে কে?" তার উত্তরে মহর্ষি বলেন, **"যস্য ত্বয়া ব্রণবিরোপণমিঙ্গুদীনাম্"** ইত্যাদি অর্থাৎ, ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে, কুশক্ষত হলে মুখ যার। শ্যামাধান্য মুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে, এই মৃগপুত্র সে তোমার ॥" (রবীন্দ্রনাথ)। শকুন্তলার আসন্নবিয়োগে কাতর হয়ে সকলেই নিকট আত্মীয়ের মত ব্যবহার করছে। মহাকবি বর্ণিত করুণরসে আপ্লুত হয়ে যেন সহৃদয়

Scanned by CamScanner

সামাজিকগণ নিজেদের সত্তা বিস্মৃত হয়ে আশ্রমবাসী জীবদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

এ নাটকের ষষ্ঠ অংকে শকুন্তলাবিরহজনিত শোকে বিহ্বল রাজাকে প্রকৃতি যেভাবে সমবেদনা জানিয়েছে তা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রাজার এই করুণ বিরহদশায় প্রকৃতির সমব্যথার চিত্র অংকন করতে গিয়ে মহাকবি বলেছেন,—**"চূতানাং চিরনির্গতাপি কলিকা বধ্নাতি ন স্বং রজঃ"** ইত্যাদি। অর্থাৎ,

"বহুদিন ধরিয়াছে আম্রেতে মুকুল,
রেণু তবু কোরকেতে নাহি দেখা যায়।
যদিও বা বিকসিত কুরবক ফুল,
এখনো রয়েছে সে গো মুকুল দশায়।
যদিও শিশির ঋতু হয়েছে অতীত,
কোকিলের কণ্ঠস্বর তথাপি স্খলিত।
মদনও তাহার সেই অর্ধাকৃষ্ট শর,
ভয়ে ভয়ে সংহারিয়া লইল সত্বর ॥" (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ)।

ক্রান্তদর্শী মহাকবি কালিদাসের মতে মানবপ্রকৃতির অবয়বভূত, প্রকৃতিকে উপেক্ষা করে কখনো মানবের জীবনযাত্রা নির্বাহ হতে পারে না। মহাকবির কল্পলোকে মানব এবং প্রকৃতি পরস্পর পরস্পরের সুখে দুঃখে অংশীদার স্বজনের মত সহাবস্থান করে। শকুন্তলা তপোবনের অবয়বতুল্যা। "তপোবনকে বাদ দিলে কেবল যে নাটকের আখ্যানভাগ ব্যাহত হয়, তাহা নহে, শকুন্তলাচরিত্রও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। তাহার চরিত্রখানি অরণ্যের ছায়া ও মাধবীলতার পুষ্পমঞ্জরীর সহিত ব্যাপ্ত ও বিকসিত। ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ কালিদাস তাঁহার নাটকে যে বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাকে বাহিরে ফেলিয়া রাখেন নাই, তাহাকে শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে উন্মেষিত করিয়া তুলিয়াছেন।" (রবীন্দ্রনাথ)।

"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে প্রকৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাধান্য বিচার করে রবীন্দ্রনাথ যে সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তা' এখানে উল্লেখের প্রবল দাবী রাখে। বিশ্বকবি বলেছেন,—"অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকে অনসূয়া-প্রিয়ংবদা যেমন, কণ্ব যেমন, দুষ্যন্ত যেমন, তপোবনপ্রকৃতিও তেমনি একজন বিশেষ পাত্র। ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ প্রকৃতিকে মানুষ করিয়া তুলিয়া তাহার মুখে কথাবার্তা বসাইয়া রূপক নাট্য রচিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতিকে প্রকৃতি রাখিয়া তাহাকে এমন সজীব, এমন প্রত্যক্ষ, এমন ব্যাপক,

Scanned by CamScanner

এমন অন্তরঙ্গ করিয়া তোলা, তাহার দ্বারা নাটকের এত কার্যসাধন করাইয়া লওয়া, এতো অন্যত্র দেখি নাই ॥" (প্রাচীন সাহিত্য)।

(১৩) "উপমা কালিদাসস্য"

মহাকবি মাঘের প্রশস্তি করতে গিয়ে কোন এক প্রাচীন সমীক্ষক একটি শ্লোকে বলেছিলেন,—

"উপমা কালিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ ॥"

মাঘকবির প্রশংসা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত শ্লোকে মহাকবি কালিদাসের উপমাপ্রয়োগ, মহাকবি ভারবির অর্থ গৌরব এবং মহাকবি দণ্ডীর পদলালিত্যেরও প্রশংসা করা হয়েছে। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল মহাকবি কালিদাসের উপমাসম্ভার। বলা বাহুল্য, "উপমা কালিদাসস্য"—এইটি একটি প্রবাদ বাক্যরূপে অধুনা প্রচলিত রয়েছে। উপমার নবীনতা ও চমৎকারিতার জন্যই মহাকবি কালিদাসের কবিখ্যাতি বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত। মহাকবি কালিদাসের উপমা নির্বাচনের ক্ষেত্র কত ব্যাপক কত বৈচিত্র্যপূর্ণ তা' দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

'উপমা' অলংকারের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন,—**"সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ"**, অর্থাৎ দুটি বিজাতীয় বস্তুর তুলনা করে উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা' বিশদভাবে একটি বাক্যে প্রকাশ করা হলে, উপমা অলংকার হয়। যেমন, "মুখং চন্দ্র ইব সুন্দরম্"—অর্থাৎ মুখ চন্দ্রের মত সুন্দর। এখানে মুখ এবং চন্দ্র দুটি বিজাতীয় পদার্থ। সৌন্দর্যের ভিত্তিতে মুখকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, এবং উভয়ের মধ্যে যে সাদৃশ্য তা' বিশদ করে একই বাক্যে প্রকাশ করা হয়েছে। সুতরাং এখানে হয়েছে উপমা অলংকার। এখানে চন্দ্র উপমান, মুখ উপমেয়, সৌন্দর্য সাধারণধর্ম এবং 'ইব' সাদৃশ্যবাচক শব্দ।

উপমা অলংকারের উপাদান বা উপকরণ হল চরটি। যথা (১) উপমান অর্থাৎ যার সঙ্গে তুলনা করা হয়, (২) উপমেয় অর্থাৎ যাকে তুলনা করা হয়, (৩) সাধারণ বা সামান্যধর্ম অর্থাৎ যে গুণ উপমান ও উপমেয় উভয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ও (৪) সাদৃশ্যবাচক শব্দ অর্থাৎ ইব, তুল্য, সদৃশ ইত্যাদি। প্রকৃতবর্ণনীয় বিষয় হল উপমেয়। অপ্রকৃত অবর্ণনীয় বিষয় হল উপমান। প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ের সুস্পষ্টতা প্রতিপাদনের জন্য কবি অবর্ণনীয় অপ্রকৃতকে অর্থাৎ উপমানকে উপস্থিত করেন। উপমান সর্বদা সর্বজনসংবেদ্য হয়, এবং তার সাহায্যেই কবি অপ্রসিদ্ধ উপমেয়ের প্রতিপাদন করেন।

'উপমা' কথাটির সাধারণ অর্থ হল তুলনা। এজন্য তুলনার ভিত্তিতে যত

Scanned by CamScanner

অলংকারের সৃষ্টি, তাদের সকলেরই সাধারণ নাম উপমা। আলংকারিক অপ্পয়দীক্ষিত তাই বলেছেন,—

"উপমৈকা শৈলূষী সংপ্রাপ্তা চিত্রভূমিকা ভেদান্।
রঞ্জয়ন্তী কাব্যরঙ্গে নৃত্যন্তী তদ্বিদাং চেতঃ ॥"

অর্থাৎ উপমা এক নটী, বিচিত্র ভূমিকায় সে অংশগ্রহণ করে কাব্যের রঙ্গমঞ্চে, আর রসিকজনের চিত্তরঞ্জন করে সঙ্গে সঙ্গে। উক্ত বহু বিচিত্র ভূমিকার মধ্যে নটীর একটি ভূমিকা হচ্ছে বিশেষ লক্ষণের উপমা নামক অলংকার। অন্যগুলি উৎপ্রেক্ষা, ব্যতিরেক, রূপক, অপহ্নুতি, সন্দেহ, ভ্রান্তিমান ইত্যাদি। সাদৃশ্যমূলক অলংকারের প্রকারভেদ মানেই সাধারণী উপমার "চিত্রভূমিকাভেদ"।

"উপমা কালিদাসস্য"-এ প্রশস্তি যদিও মহাকবি কালিদাস সম্বন্ধে অযথার্থ নয়, তবুও এইটি যেন তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার আংশিক গুণগ্রহণমাত্র। এ প্রশস্তির দ্বারা যেন বলা হচ্ছে মহাকবি কালিদাস কেবলমাত্র 'উপমা' নামক অলংকার প্রয়োগেই সুদক্ষ ছিলেন। সে কারণে 'উপমা কালিদাসস্য' উক্তিতে 'উপমা' শব্দটি লাক্ষণিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে বলেই বিবেচনা করতে হবে। এই উপমা শব্দে এখানে কেবল উপমা অলংকারকেই বোঝাচ্ছে না, তাছাড়া রূপক, উৎপ্রেক্ষা, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, অর্থান্তরন্যাস—এসকল অলংকারকেও বোঝাচ্ছে।

সুতরাং মহাকবি কালিদাসের রচনায় বিশুদ্ধ উপমাপ্রয়োগও যেমন দেখা যায়, যথা (১) গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ। চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥" (২) অধরঃ কিসলয়রাগঃ, কোমলবিটপানুকারিণৌ বাহূ। কুসুমমিব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষু সন্নদ্ধম্ ॥" (৩) "তবাস্মি গীতরাগেন হারিণা প্রসভং হৃতঃ। এষ রাজেব দুষ্যন্তঃ সারঙ্গেণাতিরংহসা"—ইত্যাদি।

তেমনি আবার তাঁর নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, প্রতিবস্তূপমা অর্থান্তরন্যাস, উৎপ্রেক্ষাদি বহুবিধ অলংকার প্রয়োগেও লক্ষ্য করা যায়। যথা (১) ইদং কিলাব্যাজমনোহরং বপুঃ তপঃক্ষমং সাধয়িতুং য ইচ্ছতি। ধ্রুবং স নীলোৎপলপত্রধারয়া শমীলতাম্ ছেত্তুমৃষির্ব্যবস্যতি।"—(এখানে নিদর্শনা অলংকারে উপমা) (২) মানুষীষু কথং বা স্যাদ্ অস্য রূপস্য সম্ভবঃ। ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদেতি বসুধাতলাৎ।" (এখানে প্রতিবস্তূপমা অলংকারে উপমা)। (৩) "সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্, মলিনমপি হিমাংশোলর্ক্ষ্মলক্ষ্মীং তনোতি। ইয়মধিকমনোজ্ঞা বল্কলেনাপি তন্বী, কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্ ॥" (এখানে অর্থান্তরন্যাস অলংকারে উপমা)। এগুলি অবশ্য উপমাত্মক অলংকারই, সুতরাং "উপমা কালিদাসস্য" এ মন্তব্য এখানেও প্রযোজ্য হতে কোন বাধা নেই। অবশ্য কালিদাস বিশুদ্ধ উপমাই এত অধিক প্রয়োগ

Scanned by CamScanner

করেছেন যে, তাঁকে উপমা প্রয়োগে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলা মোটেই অসঙ্গত নয়।

মহাকবি কালিদাসের উপমা নির্বাচনের ক্ষেত্র কত ব্যাপক, বিস্তৃত এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ তা' তাঁর রচনাসম্ভার অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করা যায়। দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষলোক, মানবের অন্তর্গূঢ় বাসনালোক ছাড়া ব্যাকরণ, দর্শন ইত্যাদি বিবিধশাস্ত্রও মহাকবির উপমা নির্বাচনের প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল। মহাকবির উপমার সঙ্গে তাঁর পরবর্তী ভারবি, মাঘ, শ্রীহর্ষ, ভবভূতি প্রভৃতি যে কোন মহাকবির রচনা থেকে উপমা নির্বাচন করে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যাবে যে, উপমা নির্বাচনের জন্য মহাকবি কালিদাসকে কোন প্রযত্নের আশ্রয় নিতে হয়নি। ধ্বন্যালোক প্রণেতা আচার্য আনন্দবর্ধনের মন্তব্যকে ভাষান্তরিত করে বলা যায়, অলংকারগুলি যেন মহাকবির লেখনীমুখে ভীড় করে এসে প্রার্থনা জানাত—"**আগে আমাকে নির্বাচন কর, আগে আমাকে**", ইত্যাদি।—"অলংকারান্তরাণি তু নিরূপ্যমাণ দুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিত চেতসঃ প্রতিভানবতঃ-কবেরহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি।" (ধ্বন্যালোক)।

যেমন,—'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের ত্রয়োদশসর্গে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমের বর্ণনা করতে গিয়ে মহাকবি উপমার পর উপমা প্রয়োগ করে চলেছেন, কিছুতেই যেন তিনি তৃপ্ত হতে পারছেন না। নীল ও শুভ্র দুটি প্রবাহের পবিত্র সঙ্গম দেখে কখনো **নীল-হংসমিশ্রিত মানসসরোবরে গমনোৎসুক শুভ্রবলাকার দৃশ্য** তাঁর মনে পড়ছে, কখনো বা **নীলপদ্মে খচিত শ্বেতপদ্মমালার সৌন্দর্য** তাঁর মানসদৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে, কখনো বা উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণিতে গাঁথা মুক্তামালার মতো তাঁর দৃষ্টিতে ধরা দিচ্ছে, আবার, কখনো বা মহাদেবের বিভূতিভূষিত ভুজঙ্গবলয় মণ্ডিত দেহসুষমা তাঁর চিত্তে উদিত হয়ে **সহসা সমগ্র বর্ণনার মধ্যে একটি অলৌকিক ভক্তিরসের** সঞ্চার করছে। এ সকল উপমা যে অত্যন্ত সহজ, শোভন, অযত্নকৃত ও নৈসর্গিক প্রতিভার স্পর্শে সমুজ্জ্বল তা অনস্বীকার্য।

কিন্তু কালিদাসের উপমার অসীমতা, নবীনতা এবং চমৎকারিতা সত্ত্বেও, বহুক্ষেত্রে আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণই যে সেগুলির উৎস সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কেননা, স্বর্গত শ্রদ্ধেয় বিদগ্ধ ও কৃতী অধ্যক্ষ, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য তাঁর 'কাব্যকৌতুক' গ্রন্থে বলেছেন যে, সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের পূর্ববর্তী প্রথিতযশা টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ এবং পরবর্তী টীকাকার পূর্ণসরস্বতী তাঁদের "মেঘসন্দেশে"র টীকার কয়েকটি স্থলে কালিদাসের উপমার সঙ্গে রামায়ণ থেকে সদৃশ শ্লোক উদ্ধার করে প্রদর্শন করেছেন যে,—ঋষিকবির রামায়ণই মহাকবির উপজীব্য। (পৃষ্ঠা ৪১/৪২)।

যেমন, রামায়ণে বিরহিণী সীতার বর্ণনা প্রসঙ্গে দেখা যায়,—

Scanned by CamScanner

"হিমহতনলিনীব নষ্টশোভা ব্যসনপরম্পরয়া নিপীড্যমানা।
সহচররহিতেব চক্রবাকী জনকসুতা কৃপণাং দশাং প্রপন্না ॥"

"মেঘদূত" গীতিকাব্যের "উত্তরমেঘ" খণ্ডে রামগিরিতে নির্বাসিত যক্ষবিরহিণী প্রিয়তমার বর্ণনা প্রসঙ্গে মেঘকে উদ্দেশ্য করে বল্‌ছে,—

"তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীকৃতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥"

অর্থাৎ, আমার বিরহে সহচরবিরহিতা চক্রবাকীর মত, শিশিরক্লিষ্ট পদ্মিনীর মত ম্লান অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়েছে।

রামায়ণের এ শ্লোকটির অন্ত্যচরণ উদ্ধার করে প্রখ্যাত টীকাকার দক্ষিণাবর্তনাথ তাঁর টীকায় বলেছেন, যে এইটিই মেঘদূতের শ্লোকের উপজীব্য।—"অস্যার্থস্য মূলম্ 'সহচররহিতেব চক্রবাকী—' ইতি শ্রী রামায়ণবচনম্। অনেন শ্রীরামায়ণবচনার্থানুসারেণ কবেঃ পূর্বোক্তঃ রামকথাভিলাষঃ স্পষ্টঃ।"

'রামায়ণের লংকাকাণ্ডে সুগ্রীবের আদেশে নল যখন বিশাল সেতু নির্মাণ করল, তখন তাকে দেখে মনে হল যেন সীমাহীন আকাশের মধ্যে স্বাতীপথ অর্থাৎ ছায়াপথ শোভা পাচ্ছে।

'স নলেন কৃতঃ সেতুঃ সাগরে মকরালয়ে।
শুশুভে সুভগঃ শ্রীমান্ স্বাতীপথ ইবাম্বরে ॥" (২২/৭০)

মহাকবি রচিত 'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের ত্রয়োদশ সর্গে রয়েছে,—রামচন্দ্র যখন সীতাকে নিয়ে পুষ্পক বিমানে আকাশ মার্গে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করছেন, তখন বানরসেনাদের দ্বারা নির্মিত সেই সুদীর্ঘ সেতু দেখিয়ে রামচন্দ্র বল্‌ছেন,—

"বৈদেহিঙ্গ পশ্যামলয়াদ্ বিভক্তং
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎ প্রসন্নম্
আকাশমাবিষ্কৃতচারুতারম্ ॥" (১৩/২)

'রঘুবংশম্' মহাকাব্যের এই অতিপ্রসিদ্ধ উপমাটি যে রামায়ণের উদ্ধৃত শ্লোকটিকে উপজীব্য করে রচিত সে বিষয়ে কারো কোন সংশয়ের লেশ থাকতে পারে কি? এরূপে একদিকে আদিকবির রামায়ণ ও অপরদিকে মহাকবি রচিত শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্য থেকে শ্লোক উদ্ধার করে তুলনামূলক বিচারের মাধ্যমে দেখান যায় যে মহাকবি কালিদাস তাঁর বহু উপমা নির্বাচনের জন্য ঋষিকবি বাল্মীকির কাছে ঋণী। প্রসঙ্গতঃ, উল্লেখ করা যায়

Scanned by CamScanner

যে, রামায়ণের কাছে মহাকবির এ ঋণের প্রতি কটাক্ষ করে মহাকবির প্রতিদ্বন্দ্বী দিঙ্‌নাগাচার্য মহাকবিকে সাহিত্যিক চৌর্যাপরাধে অভিযুক্ত করেছেন। কিন্তু আলংকারিক রাজশেখরের মতে কোন্ কবিই না চৌর্যের অপরাধে অপরাধী? তিনি তাঁর কাব্য-মীমাংসায় বলেছেন,—

"নাস্ত্যচৌরঃ কবিজনো নাস্ত্যচৌরঃ বণিগ্‌জনঃ।
স নন্দতি বিনা বাচ্যং যো জানাতি নিগূহিতুম্ ॥"

অর্থাৎ এমন কোন কবি নেই, যিনি চোর নন, এমন কোন বণিক নেই যিনি চৌর্যমুক্ত। তবে তিনিই কেবল নিন্দা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন, যিনি জানেন গোপন করবার কৌশল। তিনি আরো বলেন যে, তাঁকেই মহাকবি বলে গণ্য করা যায়, যিনি শব্দার্থ বিষয়ে কিছু পরিমাণে নতুনত্ব উদ্ভাবন করে প্রাচীন বিষয়বস্তু ও শব্দসম্ভার তাঁর কাব্যে সন্নিবেশ করে থাকেন।—"উল্লিখেৎ কিঞ্চন প্রাচ্যং মন্যতাং স মহাকবিঃ।" মহাকবি কালিদাস এ শক্তির যোগ্য অধিকারী ছিলেন। তাঁর দিব্য প্রতিভার স্পর্শে উক্ত প্রাথমিক উপাদানসমূহ অলৌকিক সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে অভিনবরূপ পরিগ্রহ করে অত্যন্ত উপাদেয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। তাই আনন্দবর্ধনাচার্য বলেছেন,—

"দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রস পরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবা ভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ ॥" (ধ্বন্যালোক ৪/৪)

এখানে দুয়েকটি অনন্যসাধারণ উপমার উদাহরণ দিয়ে এ আলোচনা এবার সমাপ্ত করা যেতে পারে।

(১) বৈয়াকরণ উপমা—

"স হত্বা বালিনং বীরস্তৎপদে চিরাকাঙ্ক্ষিতে।
ধাতোঃ স্থানমিবাদেশং সুগ্রীবং সন্ন্যবেশয়ৎ ॥" (রঘু/১২/৫৮)

অর্থাৎ বীরবর রাম বালিকে বধ করে 'আদেশ' বিধি অনুসারে এক ধাতুর স্থানে অপর ধাতুর সন্নিবেশের মত সুগ্রীবকে তাঁর চির আকাঙ্ক্ষিত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

(২) দর্শনশাস্ত্রবিষয়ক উপমা—

"যোগীব যোগবিধি শুষ্কমনা যমাদ্যৈঃ।
সাংসারিকং বিষয়ো সঙঘমমঘো-বীর্যম্ ॥" (কুমার ১৭/৪৭)

অর্থাৎ যোগীপুরুষ যেমন যমনিয়ম প্রভৃতি উপায় দ্বারা মনকে শুষ্ক করে সাংসারিক অভিলাষ সমূহ বিনষ্ট করে ফেলেন, দেবসেনাপতি কার্তিক বাণ বর্ষণের দ্বারা দৈত্যরাজের সকল অস্ত্র চূর্ণ করে ফেললেন।

(৩) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের শ্রেষ্ঠ উপমা—

"গচ্ছতি পূরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।

Scanned by CamScanner

চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥" (শকু. ১/)

অর্থাৎ বাতাসের প্রতিকূলে নীয়মান পতাকার দণ্ড যেমন আগে আগে চলে এবং পতাকা সংলগ্ন চীনাপট্টবস্ত্র যেমন পশ্চাৎদিকে ধাবিত হয়, ঠিক তেমনি আমার শরীর আগে আগে চলেছে বটে, কিন্তু আমার চঞ্চলমন ধাবিত হচ্ছে পশ্চাৎ দিকে।

(১৪) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" ঃ 'চতুর্থ ও পঞ্চম অংকের তুলনা'

মহাকবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অংকের ঘটনাস্থল ভিন্ন। চতুর্থ অংকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে, আর হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে ঘটেছে পঞ্চম অংকের ঘটনা। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমবালা শকুন্তলার পতিগৃহযাত্রাকে ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে চতুর্থ অংক, আর পঞ্চম অংকে রাজা দুষ্যন্ত কর্তৃক শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্য চিত্রিত হয়েছে। চতুর্থ অংকে অংশগ্রহণ করেছেন মহর্ষি কণ্ব, শকুন্তলা, দুই সখী অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা, দুই কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব ও শার দ্বত, এবং গৌতমী। শেষোক্ত তিন চরিত্রের ভূমিকা এখানে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁরা শকুন্তলাকে আশ্রম থেকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গিয়ে তাকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করেছে। পঞ্চম অংকে অংশ গ্রহণ করেছেন রাজা দুষ্যন্ত, শকুন্তলা, শার্ঙ্গরব, শার দ্বত ও গৌতমী। চতুর্থ অংকে কারুণ্যের আতিশয্যে যেমন অভিভূত হতে হয়, তেমনি পঞ্চম অংকে স্তম্ভিত হতে হয় বজ্রাহতের মত।

'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ এবং পঞ্চম, উভয় অংকই মহাকবি কালিদাসের প্রতিভার চরম উৎকর্ষব্যঞ্জক। উভয় অংকই কবিত্বশক্তি এবং নাট্যপ্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর। তবে দুইটি অংকই যেন পরস্পর বিরোধীভাবের সমাবেশে মণ্ডিত হয়ে স্ব স্ব শ্রেষ্ঠত্বের দাবীতে একটি অপরটিকে স্পর্ধাপূর্বক আহ্বান জানাচ্ছে। চতুর্থ অংকে হচ্ছে কণ্বাশ্রমের দৃশ্য, সেখানে শান্ত, সমাহিত এবং নিভৃত আশ্রম পরিবেশ প্রকৃতির স্বর্গীয় সুষমার সঙ্গে মানবাত্মার দৈব বৈভবের মিলন ঘটেছে। আর পঞ্চম অংকে হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদের কোলাহলমুখর অতুল ভোগ-ঐশ্বর্যের উদ্ধত অহমিকা প্রকাশমান। তাই অরণ্যবাসী কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরবের কাছে রাজপ্রাসাদ—"জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব",—অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহের মত প্রতিভাত হয়েছে।

রাজপ্রাসাদ যেমন মনুষ্যাধ্যুষিত, কণ্বাশ্রমও তাই। তবে আশ্রমের তাপসেরা সরলতায় ও পবিত্রতায়, স্নেহে ও প্রেমে মহনীয়, অকপট ত্যাগের ব্রতে তাঁরা নিত্যনিরত, কিন্তু রাজপ্রাসাদের মানুষ কর্তব্যের রূঢ়তায় এবং বুদ্ধির প্রখরতায় প্রশংসনীয়। এঁরা মুক্তিবাসনাবর্জিত, তাই ভোগের মন্ত্রে দীক্ষিত। আশ্রমে রয়েছেন মহর্ষি, আর রাজর্ষি রয়েছেন রাজপ্রাসাদে। মহর্ষি স্নেহমায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে নিয়মের কঠোরতা

Scanned by CamScanner

থেকে স্খলিত, অপরপক্ষে রাজর্ষি নীতি ও কর্তব্যে অন্ধ হয়ে প্রেমের কোমলতা থেকে বঞ্চিত। একদিকে হৃদয়বৃত্তি স্বচ্ছন্দ ও বিশ্বস্ত, অপরদিকে সংশয়াবৃত, কম্পিত ও কৃত্রিম নাগরিকবৃত্তি। তাই যোগীরা ভোগীদের যে দৃষ্টিতে দেখেন, রাজপ্রাসাদের জনসমূহকে কণ্বশিষ্য শার দ্বত সে দৃষ্টিতে দেখেছেন.—"অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্" ইত্যাদি। স্নাতব্যক্তি অস্নাতকে, শুচিব্যক্তি অশুচিকে, জাগরিত ব্যক্তি নিদ্রিতকে যেমন দেখে, ঠিক তেমনি, ইত্যাদি।

চতুর্থ অংকে যেমন সংসারবিরাগী ঋষি কণ্বের স্নেহদৌর্বল্য, পরস্পর প্রীতিমুগ্ধ সখীত্রয়ের প্রণয় মধুর সম্পর্কের অনাবিল অভিব্যক্তি, মূক-মূঢ় প্রকৃতির স্নেহোচ্ছ্বাস প্রকাশের প্রয়াস সহৃদয় সামাজিকদের মুগ্ধ না করে পারেনা, তেমনি পঞ্চম অংকে কঞ্চুকী থেকে রাজা পর্যন্ত সবলের কর্তব্যবন্ধনের যান্ত্রিক অবিচলতা, শাপজনিত বিস্মৃতির কারণে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক রূপে প্রতীয়মান রাজার বজ্রকঠোর প্রত্যাখ্যানরূঢ়তা, অথচ স্বীয় চারিত্রিক নিষ্ঠা রক্ষণে অনমনীয় অটলতা আমাদের বিশেষ আশ্চর্যান্বিত করে। অপরদিকে কল্পনায় রচিত স্বর্গ থেকে ভ্রষ্টা, এবং রূঢ় বাস্তবসংসারের কঠিন ভূমিতে পতিতা শকুন্তলার মর্মভেদী করুণ বিলাপ আমাদের আকুল করে। সুতরাং চতুর্থ অংকের প্রশস্তি সচরাচর বিঘোষিত হলেও পঞ্চম অংকও কম চিত্তাকর্ষক এবং কম উপাদেয় নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে, 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ এবং পঞ্চম উভয় অংকই করুণরসের অভিব্যক্তিতে বেদনাদায়ক। চতুর্থ অংকে দেখা যায়, মাতৃপিতৃ পরিত্যক্তা শকুন্তলা মহর্ষি কণ্বকর্তৃক আজন্ম প্রতিপালিতা, এবং আশ্রমে পরিবর্ধিতা। পতিগৃহযাত্রাকালে পালকপিতা কণ্ব, আবাল্যসখী দ্বয়, এবং চিরাভ্যস্ত আশ্রম পরিবেশ ত্যাগ করে শকুন্তলা চলে যাচ্ছে। কাজেই এ বিচ্ছেদ কেবল শকুন্তলার নয়, উক্ত তিন পক্ষ থেকেই শোকের অভিব্যক্তি হওয়া স্বাভাবিক ও অভিপ্রেত। পঞ্চম অংকেও করুণরসের প্রকাশ। কিন্তু এ করুণরস অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নগ্ন, তীব্র ও মর্মভেদী। পঞ্চম অংকের সূচনাতেই হংসপদিকার গীতের মাধ্যমে এই বিষাদের আভাস সূচিত হয়েছে। কোন প্রিয়জনবিরহ নেই, অথচ রাজার হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত। এ কি জন্মান্তরের কোন প্রণয়স্মরণে? সহৃদয় সামাজিকদের আর বুঝতে বাকী থাকল না যে, দুর্বাসার অভিশাপে স্মৃতিলোপহেতু এ জন্মের প্রণয়িণীকে চিনতে না পেরে তাকে বর্জন করতে চলেছেন।

এ নাটকের চতুর্থ অংকে বর্ণিত ঘটনার মধ্যে আমরা আমাদের আপন হৃদয়ের যতটুকু মিল দেখতে পাই, পঞ্চম অংকের ঘটনার মধ্যে তা'র নিতান্তই অভাব। ভারতবর্ষের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহিতা কন্যাকে প্রথম পতিগৃহে পাঠাবার আনুষ্ঠানিক প্রথার প্রচলন রয়েছে। কাজেই এ দৃশ্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত এবং এ

Scanned by CamScanner

কারণে তা' আমাদের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে যত আবেদনশীল হয়, পঞ্চমাংকের ঘটনা তা' একেবারেই নয়। কেননা, আমাদের সাধারণ জীবনে পঞ্চমাংকে বর্ণিত ঘটনার অবকাশ নিতান্তই বিরল। অধিকাংশ সমীক্ষকের মতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংক অর্থাৎ যে অংকে শকুন্তলা তপোবন থেকে বিদায় নিয়ে পতিগৃহে যাত্রা করেছে, সে অংকই শ্রেষ্ঠ।—

"কালিদাসস্য সর্বস্বম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্।
তত্রাপি চতুর্থোঽঙ্ক যত্র যাতি শকুন্তলা ॥"

আবার, অনেকে বলেন, তা ঠিক নয়, এ নাটকের পঞ্চম অংকই শ্রেষ্ঠ।—

"শাকুন্তলচতুর্থোঽঙ্কঃ সর্বোৎকৃষ্ট ইতি প্রথা।
ন সর্বসম্মতা যস্মাৎ পঞ্চমোঽস্তি ততোঽধিকঃ ॥"

সমগ্র নাটক থেকে একটি বিশেষ অংককে নির্বাচন করে, অংকগত বিচারের মাধ্যমে তার মূল্যায়ন করে তাকে প্রাধান্য দেওয়া সঙ্গত ও সমীচীন নয়। কেননা, সপ্ত অংকের নাটকে প্রতিটি অংকই তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করে নাট্যক্রিয়ার গতিসঞ্চারের মাধ্যমে নাটককে ঈপ্সিত পরিণতির দিকে অগ্রসর করিয়ে দেয়। তাই কোন অংকের গুরুত্বকে লাঘব করা চলেনা। তথাপি এ নাটকের চতুর্থ অংককে যাঁরা শ্রেষ্ঠ অংকের মর্যাদায় ভূষিত করতে চান, তাঁরা মূলতঃ শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার করুণ দৃশ্যের বর্ণনা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা, পালিতাকন্যার আসন্ন বিচ্ছেদজনিত শোকে মহর্ষি কণ্বের বিহ্বলতা ইত্যাদির উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। এ দৃশ্যের কারুণ্যের আতিশয্য সহৃদয় সামাজিক এবং পাঠকবর্গকে বিশেষ প্রভাবিত করে।

সংসারত্যাগী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হলেও মহর্ষি তাঁর পালিতা কন্যার আসন্ন বিদায় স্মরণ করে নিতান্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছেন। শকুন্তলা আজ পতিগৃহে যাবেন ভেবে তাঁর "হৃদয়ং সংস্পৃষ্টম্ উৎকণ্ঠয়া", উৎকণ্ঠায় তাঁর হৃদয় পীড়িত, কণ্ঠ তাঁর—"স্তম্ভিতবাষ্প-বৃত্তিঃ", অশ্রুপ্রবাহে রুদ্ধ, "চিন্তাজড়ং চ দর্শনম্" অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টি চিন্তায় আচ্ছন্ন। বনবাসী ঋষি পালক পিতা হয়ে যদি পালিতাকন্যার বিরহে এরূপ বৈক্লব্য অনুভব করেন, তাহলে গৃহী পিতা আপন কন্যার বিচ্ছেদে যে কত অধিক বেদনা অনুভব করেন তা' তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদা, শকুন্তলা দুই সখী শকুন্তলাকে সাজাতে এলে শকুন্তলা ক্রন্দন করতে করতে বললেন,—"দুর্লভমিদানীং মে সখীমণ্ডনং ভবিষ্যতি",—সহায় এখন থেকে আর সখীদের হাতে ত আর সাজতে পাবনা।" আশ্রমের চেতন-অচেতন সকলের সঙ্গে শকুন্তলার এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত যে, পতি গৃহ যাত্রাকালে বনদেবতারা শকুন্তলার মণ্ডনের জন্য অমূল্য আবরণ, আভরণ ও অলক্তক উপহার দিচ্ছে, তারা যেন রাজরাণীর যোগ্য বসনভূষণে সজ্জিত করে তাদের স্নেহের দুলালীকে পতিগৃহে পাঠাতে চাইছে।

Scanned by CamScanner

মহর্ষি কণ্ব যখন আশ্রম তরুদের উদ্দেশ্যে বললেন,—"তোমাদের জল না করি দান যে আগে জল না করিত পান/ সাধ ছিল যার সাজিতে, তবু স্নেহে পাতাটি না ছিঁড়িত কভু / তোমাদের ফুল ফুটিত যবে, যেজন মাতিত মহোৎসবে। পতিগৃহে সে বালিকা যায়, তোমরা সকলে দেহ বিদায়।" (রবীন্দ্রনাথ)। সঙ্গে সঙ্গে কোকিলের মধুর কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অনুমতি পাওয়া গেল।

যে আর্যপুত্রের চিন্তায় অতিথিপরায়ণ শকুন্তলারও কর্তব্যে চ্যুতি ঘটেছে, যে তার সকল ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু, যাঁর ক্ষণিক মিলনের স্মৃতি সে তখন তার শরীরে ও মনে বহন করছে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হতে সে এখন রাজধানীতে চলেছে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আশ্রম ছাড়তে গিয়ে সে যেন জীবনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবার বেদনায় কাতর। প্রিয়ংবদা তখন জানায় যে, তার আসন্নবিদায়ের শোকে তপোবনেরও সেই একই দশা,—"মৃগের গলি পড়ে মুখের তৃণ, ময়ূর নাচে না আর। খসিয়া পড়ে পাতা লতিকা হতে, যেন সে আঁখিজলধার ॥' (রবীন্দ্রনাথ)। পথ চলতে চলতে পশ্চাৎ থেকে বাধা পেয়ে শকুন্তলা বলল,—"কো নু খলু মে বসনে সজ্জতে"? কে আমার বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করে? উত্তরে মহর্ষি বললেন,—"ইঙ্গুদীর তৈল দিতে স্নেহসহকারে, কুশক্ষত হলে মুখ যার/শ্যামাধান্য মুষ্টি দিয়ে পালিয়াছ যারে, এই মৃগ পুত্র সে তোমার ॥" (প্রাচীন সাহিত্য)। তাই বিশ্বকবি বলেন,—"বনের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক করুণ হইতে পারে তাহা জগতের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে কেবল 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংকে পাওয়া যায়।" (প্রাচীন সাহিত্য)।

পতিগৃহ যাত্রাকালে মহর্ষি কণ্ব পতিগৃহে শকুন্তলার আচরণীয় ও অনাচরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে যে সকল মূল্যবান উপদেশ দিয়েছিলেন, দেশ ও কাল নির্বিশেষে সকল কর্তব্যপরায়ণ, দায়িত্বশীল ও মমত্ববোধসম্পন্ন পিতার পক্ষে তাঁদের আপন আপন তনয়ার প্রথম পতিগৃহ যাত্রাকালে এরূপ উপদেশ দানই সমীচীন। সেবাপরায়ণতা, পতিভক্তি, সপত্নীর প্রতি প্রিয়সখী ব্যবহার, আত্মীয়পরিজন ও সেবক-সেবিকার প্রতি দাক্ষিণ্যপ্রদর্শন, ঐশ্বর্যে অহমিকারিক্ততা ইত্যাদি নবপরিণীতা কুলবধূর চরিত্রে সেকালে অভিপ্রেত ছিল। এসকল উপদেশের সার্ব্বজনীনত্ব ও শাশ্বতঃ গুণ সে যুগে অস্বীকার করবার কোন উপায় ছিল কি? একেবারে অন্তিমলগ্নে শকুন্তলা পিতাকে আলিঙ্গন করে বলল যে, তপশ্চর্যায় তাঁর শরীর পীড়িত হয়েছে। সুতরাং শকুন্তলার জন্য তিনি যেন অত্যধিক উৎকণ্ঠিত না হন। ঋষি কণ্বও দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, "বৎস, কুটীরের পুরোভাগে তোমার দ্বারা পূর্বে রচিত নীবারধান্যের উপহারকে অংকুরিত হতে দেখে কিভাবে আমার শোককে শান্ত করব? শকুন্তলার সে স্মৃতি দেখতে দেখতে মহর্ষির শকুন্তলাবিচ্ছেদজনিত শোক কীভাবে প্রশমিত হবে? শকুন্তলার জন্য

Scanned by CamScanner

মহর্ষির শোকের অভিব্যক্তি যে এখানে চরম বাণীরূপ লাভ করেছে, তা' অস্বীকার করার উপায় নেই। এভাবে আশ্রমের সমুদয় তরুলতা, পশুপক্ষীর কাছে বিদায় নিয়ে শকুন্তলা কাঁদতে কাঁদতে আশ্রম ত্যাগ করেছে। এখানে বলা যায় যে, উক্ত আলোচনার ধারা বিচার করে সমীক্ষকগণ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'' নাটকের চতুর্থ অংককে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে মন্তব্য করেছেন।

যাঁরা এ নাটকের পঞ্চম অংককেই শ্রেষ্ঠ বলেন, তাঁদের মতে ঘটনাসন্নিবেশের দক্ষতা, আদর্শ দ্বন্দ্বের বর্ণনানৈপুণ্য, চরিত্রাংকনের বিশিষ্টতা ও নাটকীয়তা সৃষ্টির কুশলতা ইত্যাদি তাঁদের এরূপ দাবীর যুক্তিগ্রাহ্য কারণ। পঞ্চমাংকের ঘটনাসন্নিবেশ সত্যই অনুপম ও হৃদয়গ্রাহী, এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এইটি মহাকবি কালিদাসের অপূর্ব নাট্যশৈলীর পরিচয় বহন করে। এ অংকের প্রারম্ভেই হংসপদিকার গীত শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের ভূমিকা নিপুণভাবে প্রস্তুত করে দিয়েছে। দুষ্যন্ত-শকুন্তলার প্রণয় গান্ধর্বপরিণয়ে পরিণতি লাভ করবার পর ভাবী উচ্চাশায় উদ্দীপ্তা শকুন্তলা পতিগৃহে স্থান পাবে কি না তা' জানবার জন্য পাঠক ও সামাজিক চিত্ত ব্যাকুল। হংসপদিকার গীত শ্রবণ করেও রাজা বুঝলেন না যে দুর্বাসার অভিশাপে তাঁর স্মৃতিলোপহেতু তিনি এ জন্মেরই প্রণয়িণীকে চিনতে না পেরে বর্জন করতে চলেছেন। **হংসপদিকার এ গীত একদিকে যেমন রাজার প্রতি তিরস্কার অন্যদিকে তেমনি শকুন্তলার দুর্ভাগ্যের সূচক।**

আবার, রাজপ্রাসাদে রাজার সম্মুখে গৌতমী ও কণ্বশিষ্য দ্বয়ের সঙ্গে শকুন্তলা সমাগমে শার্ঙ্গরব-শার দ্বতের উক্তি থেকে নাগরিকজীবন ও তপোবনজীবনের প্রতিচ্ছবির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। আশ্রমজীবনের শান্তপরিবেশে বর্ধিত, সরলতার আধার, শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া। নাগরিক সভ্যতার কুটিলতা, কৃত্রিমতার আড়ম্বর, প্রতারণার ছায়া এখানে রাজ্যে ও রাজচরিত্রে প্রতিফলিত। আশ্রমপরিবেশের সঙ্গে নাগরিক পরিবেশের অসামঞ্জস্য এখানে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানে প্রকট হয়ে উঠেছে। অবগুণ্ঠনমুক্ত শকুন্তলাকে দেখেও রাজা চিনতে পারলেন না। রাজার মধ্যে আদর্শের দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে উঠল। ধর্মপত্নী বলে দাবী করছেন, এমন এক অপরিচিতা অসামান্যাসুন্দরী নারীর কথায় বিশ্বাস করে, তাঁকে গ্রহণ করে. রাজা ধর্মপালন করবেন অথবা পরস্ত্রী জেনেও তাঁকে গ্রহণ করে পাপভাগী হবেন। দুর্বাসার অভিশাপের প্রভাবে হোক, বা অন্য কোন কারণে হোক, রাজা ধীরচিত্তে বিচার বিবেচনার দ্বারা মানসিক চাঞ্চল্য সংযত করে শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। **কর্তব্যে কঠোর রাজার চরিত্র সত্যই অনবদ্য।**

Scanned by CamScanner

শকুন্তলার চরিত্র সৃষ্টিও এখানে প্রশংসনীয়। চতুর্থ অংকের কুসুমপেলবা শকুন্তলা প্রত্যাখ্যানের রূঢ় আঘাতে আহত হয়ে কঠোর প্রতিবাদপরায়ণা। মিথ্যাচার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে শকুন্তলা রাজাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন। বিপদের মুখে সরলতা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক শকুন্তলাই ধৈর্যের সঙ্গে প্রমাণ উপস্থিত করে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। রাজার মনে বিশ্বাস জন্মাতে ব্যর্থ হয়ে আশ্রমে ফিরে যাবার পথ রুদ্ধ দেখে, এবং পুরোহিতের গৃহে অবস্থানকে অমর্যাদাকর ভেবে শকুন্তলা আত্মত্যাগে প্রস্তুত হয়েছেন,—"ভগবতি বসুধে, দেহি মে বিবরম্" অর্থাৎ বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার গহ্বরে প্রবেশ করি। এ দৃশ্য বড়ই করুণ, বড়ই মর্মস্পর্শী। কারুণ্য এ অংকেও অত্যন্ত উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

এ অংকের নাটকীয় অবস্থার অধিকতর চমৎকারিত্ব এই যে, রাজা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা উভয়েই নিরপরাধ। কেবল দুর্বার ঘটনাচক্রে এ বিষ উঠ্‌ছে। একদিকে শকুন্তলা ঘৃণায়, লজ্জায়, লাঞ্ছিত প্রণয়ের ধিক্কারে, ক্ষোভে রোষে উন্মাদিনী, অন্যদিকে দুষ্যন্ত স্থির, ধীর, শান্ত। কিন্তু তাঁর হৃদয়ে যে কি ঝড় বইতেছিল, কালিদাস অপূর্ব কৌশলে এই নিষ্ঠুর দৃশ্যের অবসানে একটি মাত্র কথায় তার ইঙ্গিত করেছেন,—**"প্রতিহারী, আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে শয়নগৃহের পথ দেখাও।"** এ অংকে অলৌকিক বর্ণনও এতই নিপুণতার সঙ্গে সম্পাদিত হয়েছে যে, কোথাও মনের মধ্যে অস্বাভাবিকতার লেশমাত্র উদয় হয়না।—এসব কারণ বিচার করেই সমালোচকগণ 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অংককে শ্রেষ্ঠ অংকের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ আগ্রহী।

উপসংহারে বলা যায় যে, 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের চতুর্থ অংকে বর্ণিত শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার করুণদৃশ্যটি গীতিকাব্যের সুরে বাঁধা। সুতরাং সমগ্র নাটকের অঙ্গহিসেবে বিবেচনা না করে, বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে কবিত্বের দিক থেকে চতুর্থ অংককেই শ্রেষ্ঠ বলতে হবে। কিন্তু সমগ্র নাটকের অঙ্গহিসেবে বিচার করলে পঞ্চম অংকই যে শ্রেষ্ঠ, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। কারণ, নাটকের যে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য (নাটকের গতি ও চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব) তা' কেবল পঞ্চম অংকেই প্রাধান্য পেয়েছে। চতুর্থ অংকে এ দুটির অভাব পরিলক্ষিত হয়। চতুর্থ অংকের গতি একেবারেই মন্থর, এবং চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব এখানে নেই বললেই হয়। সুতরাং কাব্যগুণে চতুর্থ অংক শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হলেও পঞ্চম অংক নাট্যগুণে উৎকৃষ্ট। চতুর্থ অংকের করুণ বিদায় দৃশ্যে যতটা কাব্য আছে নাটকে ততটা নেই। চতুর্থ অংকের লিরিকধর্মিতা যত অধিক, নাট্যধর্মিতা ততটা নেই, লিরিকের প্লাবন দুর্বল করেছে নাটককে।

Scanned by CamScanner

(১৫) "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ঃ সমাজচিত্র বিশ্লেষণ"

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজ তার ভাল-মন্দ সব কিছু নিয়ে সাহিত্যের দর্পণে প্রতিফলিত হয়। সমাজ থেকে রসগ্রহণ করে সাহিত্য যেমন পুষ্টি লাভ করে, তেমনি আবার সাহিত্য নানাভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে। সমাজ ও সাহিত্য উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক তাকে কোনমতেই উপেক্ষা করা চলে না। সাহিত্যে সমাজের বিশ্বস্ত প্রতিচ্ছবি অভিপ্রেত। মহাকবি কালিদাস রচিত "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকেও সে যুগের সমাজের যে সকল মূল্যবান তথ্য সুলভ তার একটা সামগ্রিক পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে। যেমন,—

(১) **বর্ণাশ্রমব্যবস্থা**—মহাকবি কালিদাসের সময় সারা দেশ বর্ণাশ্রমধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত ছিল। ধর্মশাস্ত্রকার মনুর নির্দেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারবর্ণের লোকেদের যে কর্তব্য নির্ধারিত ছিল, তারা নিজ নিজ জীবন সে অনুসারে নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করত। রাজা ছিলেন বর্ণাশ্রম ধর্মের শ্রেষ্ঠ রক্ষক। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তপস্বিদের সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান দেওয়া হত। কর্তব্যের প্রতি সামান্যতম শৈথিল্য বা উপেক্ষা, কিংবা কর্তব্য সম্পর্কে বিস্মৃতি মহর্ষিদের অভিশাপ বা তিরস্কারের কারণ হত। তাপসদের যাগযজ্ঞাদি নিয়তই অনুষ্ঠিত হত, যাগযজ্ঞে পশুবলি প্রথার প্রচলন ছিল। জাতিগত পেশা অপরের চোখে নিন্দনীয় হলেও সে নিজে কখনো তার অমর্যাদাকর বলে মনে করত না, বরং পুরুষানুক্রমে স্বধর্মপালন করাই গৌরবজনক বলে বিবেচিত হত।

(২) **রাজা ও রাজ্যশাসন**—মহাকবি কালিদাসের সমসাময়িককালে এবং তারপূর্ব থেকে সারাদেশ ক্ষুদ্র বৃহৎ বহ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। রাজারা স্বাধীনভাবে যে যাঁর রাজ্যে রাজত্ব করতেন। তাঁদের মধ্যে কখনো কখনো যুদ্ধবিগ্রহও বেধে যেত। রাজাদেরও শাস্ত্রের বিধান মেনে চলতে হতো। মহাকবির মতে শৌর্যহীন রাজনীতি কাপুরুষের লক্ষণ, এবং নীতিহীন শৌর্য—পশুবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সে কারণে রাজাদের নীতি ও শৌর্য, উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে শাসনব্যবস্থা নির্ধারণ করতে হত ॥

(৩) **বার্ষিক কর বা রাজস্ব ব্যবস্থা**—'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের দুটি শ্লোক থেকে জানা যায় যে, রাজ্যের প্রজাসাধারণ রাজাকে তাদের উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ বার্ষিক কর হিসেবে দিত। যেমন,—

"যদুত্তিষ্ঠতি বর্ণেভ্যো নৃপাণাং ক্ষয়ি তদ্ধনম্।
তপঃ ষড়্ভাগসক্ষয্যং দদত্যারণ্যকাঃ হি নঃ ॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি চারবর্ণ থেকে যে ধন কররূপে উদ্ধৃত হয়, রাজাদের সে ধন নশ্বর, কিন্তু অরণ্যবাসী মুনিগণ তপস্যালব্ধ ফলের যে ষষ্ঠাংশ রাজগণের সন্মানার্থে দান করেন তা' অবিনশ্বর। আবার, এ নাটকের পঞ্চমাংকে উল্লেখ করা হয়েছে,—"ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম

Scanned by CamScanner

এষঃ।" অর্থাৎ যাঁরা প্রজারক্ষণের কার্যে নিযুক্ত তাঁদের কোন বিশ্রাম থাকে না। তেমনি ষষ্ঠাংশবৃত্তিঃ অর্থাৎ রাজার ধর্মও অনুরূপ। যেহেতু রাজা প্রজাদের কাছ থেকে তাঁদের উৎপন্ন শস্যের এক ষষ্ঠাংশ বার্ষিক কররূপে গ্রহণ করেন, সেজন্য রাজাকে বলা হয় "ষষ্ঠাংশবৃত্তিঃ"।

(৪) **অসবর্ণবিবাহ**—নাটকের প্রথম অংকে রাজা দুষ্যন্ত যখন প্রথমে বৃক্ষান্তরাল থেকে শকুন্তলাকে দেখলেন, এবং তার প্রতি প্রণয়াকর্ষণ অনুভব করলেন, তখন রাজার মনে সন্দেহ হ'ল,—এ শকুন্তলা নিশ্চয়ই বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ মাতা-পিতার সন্তান নয়,—মহর্ষি কণ্বের কোন অব্রাহ্মণ পত্নী থেকে হয়তো এর জন্ম, তা' নাহলে তাঁর মত আর্যের মন কখনো এর প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হ'ত না। তাই রাজা মনে মনে প্রশ্ন করলেন,—"অপি নাম কুলপতেরিয়ম্ অসবর্ণক্ষেত্রসম্ভবা স্যাৎ?" অর্থাৎ কুলপতি কণ্বের ইনি কি কোন অসবর্ণ পত্নীগর্ভজাতা কন্যা হবেন?" এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, মহাকবি কালিদাসের কালে সমাজে অসবর্ণবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল।

(৫) **বহুবিবাহপ্রথা**—সেকালে রাজা এবং ধনীব্যক্তিদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল, এবং সমাজে তা' স্বাভাবিকভাবেই স্বীকৃত হত। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের বহুস্থলেই এর উল্লেখ রয়েছে। বহুবল্লভ রাজা দুষ্যন্তের যেহেতু একাধিক পত্নী, সেজন্য তিনি যাতে শকুন্তলাকেও তাঁদের সঙ্গে সমান অনুরাগগর্ভ দৃষ্টি দিয়ে দেখেন, রাজার কাছে অনসূয়ার এ অনুরোধ।—"বয়স্য বহ্বল্লভা রাজানঃ শ্রূয়ন্তে। যথা আবয়োঃ প্রিয়সখী বন্ধুজন শোচনীয়া ন ভবতি, তথা নির্বাহয়।" এর উত্তরে রাজাও বললেন, "পরিগ্রহবহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্যমে। সমুদ্ররসনা চোর্বী সখী চ যুবয়োরিয়ম্।" অর্থাৎ বহু পত্নী থাকলেও আমার কুলের প্রতিষ্ঠা কেবল দুটি উপকরণের উপর নির্ভরশীল, তার একটি হ'ল সমুদ্রবেষ্টিত এ পৃথ্বী, এবং তোমাদের প্রিয়সখী শকুন্তলা।

(৬) **গান্ধর্ববিবাহপ্রথা**—প্রাচীন ধর্মশস্ত্র মনুসংহিতায় ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, আসুর, গান্ধর্ব ইত্যাদি যে আট প্রকার হিন্দু বিবাহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, গান্ধর্ব তাদের মধ্যে অন্যতম। গান্ধর্ববিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, সমাজস্বীকৃত এবং সমাজসমর্থিত। সেকালে কেবল গান্ধর্বপরিণয় প্রচলিত ছিলনা, গান্ধর্বমতে বিবাহিত দম্পতি গুরুজনদের দ্বারা অভিনন্দিত হত, গুরুজনেরা সানন্দে এ বিবাহ সমর্থন করতেন। বর এবং কনে, পরস্পরের সম্মতির উপর নির্ভর করে, গুরুজন অনুমতিব্যতিরেকে, কোন এক মনোরম প্রাকৃতিক নিভৃতপরিবেশে মিলিত হয়ে কেবল মাল্যবিনিময়ের মাধ্যমে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলে তাকে গান্ধর্ববিবাহ বলে। "ইচ্ছয়া অন্যোন্যসংযোগাৎ কন্যায়াশ্চ বরস্য চ। স তু গান্ধর্বঃ বিজ্ঞেয়ঃ মৈথুন্যঃ কামসম্ভবঃ ॥" আবার, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার "বীরমিত্রোদয়"

Scanned by CamScanner

টীকায় বলা হয়েছে,—"ত্বং মে পতিঃ, ত্বং মে ভার্যা, ইত্যেবং কন্যা-বরয়োঃ পরস্পরং নিয়মবন্ধনং পিত্রাদিকর্তৃকদান-নিরপেক্ষয়োঃ বিবাহঃ স গান্ধর্ব ॥" (১/৬১(

(৭) **আলেখ্য চেতনা**—মহাকবি কালিদাসের কালে নারীপুরুষ উভয়ের মধ্যে আলেখ্যচেতনার নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজর্ষি দুষ্যন্ত একজন উৎকৃষ্ট চিত্রশিল্পী ছিলেন। বিরহবিনোদনের জন্য প্রিয়তমা শকুন্তলার চিত্র অংকন করে বিরহবিধুর চিত্তে সান্ত্বনা লাভের জন্য প্রয়াস পেতেন। বিদূষক ও সানুমতী রাজা দুষ্যন্তের চিত্রকর্মনৈপুণ্যের প্রশংসা না করে পারলেন না। ষষ্ঠ অংকে "কার্যা সৈকতলীনা হংসমিথুনা স্রোতোবহ্-মালিনী"—ইত্যাদি শ্লোকে বলা হয়েছে,—'মালিনীনদীর সৈকতে সংলগ্ন হংসমিথুন আঁকতে হবে, পবিত্র হিমালয়ের পাদদেশ ও তথায় উপবিষ্ট হরিণ, কোন এক বৃক্ষের শাখায় প্রলম্বিত বল্কলবসন, এবং বৃক্ষের তলদেশে মৃগীর বামচক্ষুপ্রান্ত কণ্ডুয়নে রত কৃষ্ণসার মৃগ অংকন করতে হবে।' এ নাটকের চতুর্থ অংক থেকেও জানা যায় যে, নারীদেরও চিত্রবিদ্যা জানা ছিল। শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রাকালে তাকে সাজাবার সময় অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা বলল,—"চিত্রকর্মপরিচয়েন অঙ্গেষু তে আভরণবিনিয়োগং কুর্ব্বঃ"—ইত্যাদি, অর্থাৎ আমাদের চিত্রকর্মের সঙ্গে পরিচয়ের জ্ঞান থেকে তোমাকে আমরা অলংকারে সাজাব।

(৮) **স্ত্রী শিক্ষা**—সুপ্রাচীন বেদের যুগ থেকেই এদেশে যে নারী শিক্ষার প্রচলন ছিল তা' গার্গী, মৈত্রেয়ী ইত্যাদি বিদূষী রমণীগণের কাহিনী থেকেই স্পষ্ট জানা যায়। মহাকবি কালিদাসের যুগেও স্ত্রীশিক্ষা অবশ্যই প্রচলিত ছিল। তবে কেবল গ্রন্থপাঠেই সেকালের শিক্ষা সীমাবদ্ধ ছিল না। 'শ্রুতি' অর্থাৎ শ্রবণও শিক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উপায় ছিল। মুনিঋষিগণের কাছ থেকে পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি নানা গ্রন্থের বিষয় শ্রবণ করেও নারীগণ অনেক কিছু শিক্ষার সুযোগ পেতেন। যেমন, মহর্ষি মারীচের আশ্রমে অদিতি কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে ভগবান্ মারীচ মুনি পত্নীগণকে পাতিব্রত্যধর্মের উপদেশ দিচ্ছেন। মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা যে শিক্ষিতা ছিল তার প্রমাণও নাটকে পাওয়া যায়। যখন শকুন্তলা দুষ্যন্তের প্রতি নিজের দুর্দমনীয় প্রেম সখীদের কাছে ব্যক্ত করতে সংকোচ বোধ করছিল, তখন অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে বলল,—"হলা শকুন্তলে, অনভ্যস্তরাঃ খলু বয়ং মদনগতস্য বৃত্তান্তস্য। কিন্তু সাদৃশী ইতিহাসনিবন্ধেষু কাময়মানানামবস্থা শ্রূয়তে তাদৃশীং তে প্রেক্ষে।" অর্থাৎ আমাদের নিজেদের প্রেমবিষয়ক অভিজ্ঞতা নেই বটে, কিন্তু ইতিহাস, পুরাণ, লোকগাথা, গল্প প্রভৃতিতে প্রেমিকদের যেরূপ অবস্থা হওয়ার কথা শুনেছি, তোমার অবস্থাও সেরূপ দেখতে পাচ্ছি। নারীদের শ্লোকরচনা করার ক্ষমতা এবং প্রেমপত্র রচনা করার দক্ষতার কথাও রাজা দুষ্যন্তের উদ্দেশ্যে শকুন্তলার পদ্মদলের উপর নখের দ্বারা প্রণয়লিপি রচনার ঘটনা থেকে জানতে পারি।

Scanned by CamScanner

(৯) **সুগৃহিণীর কর্তব্য**—মহাকবি কালিদাসের কালে গৃহীপিতা কন্যার প্রথম পতিগৃহযাত্রাকালে সুগৃহিণীর কর্তব্য সম্পর্কে যে সকল উপদেশ দিতেন সেগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন,—

"শুশ্রূষস্ব গুরূন্ কুরুপ্রিয়সখীবৃত্তিং সপত্নীজনে
ভর্তুর্বিপ্রকৃতাপি রোষণতয়া মাস্ম প্রতীপং গমঃ।
ভূয়িষ্ঠং ভব দক্ষিণা পরিজনে ভোগেষ্বনুৎসেকিনী
যান্ত্যেবং গৃহিণীপদং যুবতয়ো বামাঃ কুলস্যাধয়ঃ ॥"

অর্থাৎ পতিগৃহে গমন করে গুরুজনদের সেবা কর, সপত্নীগণের সঙ্গে প্রিয়সখীর মত ব্যবহার কর, পতিকর্তৃক তিরস্কৃতা হলেও রোষবশতঃ তাঁর বিরুদ্ধাচরণ কর না, পরিচারক-পরিচারিকাদের প্রতি সর্বদা দাক্ষিণ্যপ্রবণ হও, ভোগৈশ্বর্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে গর্বিতা হয়ো না। যে যুবতিগণ এ সকল আচরণ করে, তারা গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিতা হয়, এর বিপরীত আচরণ করে যে নারীগণ তারা কুলের কলংক স্বরূপ হয়। কুলবধূর যে সকল গুণ থাকা উচিত, সেই বিনয়, সেবা, পতিভক্তি, আত্মীয়স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দাসদাসীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, এ সবই সেকালে সুগৃহিণীর কর্তব্য বলে বিবেচিত হত। সেকালের সামাজিক তথ্য হিসেবে এর এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে।

(১০) **আন্তর্দেশীয় বাণিজ্য ও নৌবাণিজ্য**—মহাকবি কালিদাসের কালে স্থলপথেও আন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের প্রচলন ছিল। চীন, শ্যাম, কাম্বোজ ইত্যাদি দেশের সঙ্গে বিবিধ পণ্যের ক্রয়বিক্রয় চলত। সংস্কৃত সাহিত্যের অনেক স্থলে কাম্বোজ দেশীয় অশ্ব এবং চীন দেশীয় রেশমের উল্লেখ আছে। এ নাটকের প্রথম অংকের শেষে রাজা দুষ্যন্ত এবং শকুন্তলা ও সখী দ্বয়ের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর যখন হস্তীর উপদ্রবে শকুন্তলা ও সখী দ্বয় চলে যেতে বাধ্য হল, রাজাও ফিরে যেতে যেতে বললেন,—

"গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ।
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য ॥"

অর্থাৎ রাজার শরীর অগ্রে চলেছে, কিন্তু তাঁর অস্থির চিত্ত পশ্চাতে চলেছে। চীনদেশীয় রেশমবস্ত্র নির্মিত পতাকা, দণ্ডসহ বাতাসের প্রতিকূলে নিতে গেলে, দণ্ডটি যেমন আগে আগে চলে, কিন্তু দণ্ডের সঙ্গে লগ্ন চীনদেশীয় রেশমবস্ত্র নির্মিত পতাকা চলে বাতাসের পশ্চাৎ দিকে, ঠিক তেমনি। তাছাড়া, এ নাটকের ষষ্ঠ অংকে বর্ণিত নৌব্যবসায়ী ধনমিত্রের নৌব্যসনে মৃত্যুর ঘটনা থেকে আমরা সেকালের নৌবাণিজ্য সম্পর্কেও মোটামুটি ধারণা করতে পারি।

(১১) **আরক্ষ-বিভাগ বা পুলিশ প্রশাসন**—সেকালেও বর্তমান কালের পুলিশব্যবস্থার মত আরক্ষ-বিভাগ ছিল। বর্তমানে যেমন পুলিশ বিভাগের অধিকর্তা বা সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট্

Scanned by CamScanner

থাকে, সেরূপ তখনও নাগরিক বা নগররক্ষিদলের অধিকর্তা ছিল। এই নাগরিকের পদ সাধারণতঃ রাজার শ্যালক গ্রহণ করতেন। নাটকের ষষ্ঠ অংকে নগররক্ষায় কর্তব্যসচেতন রক্ষিপুরুষদের কথা রয়েছে। নাগরিক অর্থাৎ নগরপাল বা নাগরিকের তত্ত্বাবধানে রক্ষিপুরুষেরা দিবারাত্র কার্যে লিপ্ত থাকত। তারা কেবল যে রাত্রে প্রহরার কাজে নিযুক্ত থাকত তা' নয়, দিনের বেলায়ও রাজপথে এবং জনাকীর্ণস্থানে অবস্থান করে তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখতো কেউ চোর্য বা বলপূর্বক কারো দ্রব্য হরণ করছে কিনা। এরূপ লক্ষ্য রাখা অবস্থাতেই দুজন রক্ষিপুরুষ জানুক ও সূচক রাজার নামাংকিত অঙ্গুরীয়ক ধীবরের হস্তে দেখে তাকে বন্দী করে বিচারের জন্য রাজার কাছে নিয়ে চলেছে রাজশ্যালকের নির্দ্দেশে। পথে যেতে সন্দেহভাজন ধীবরের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য তাকে নানাভাবে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখানে হচ্ছে, এমনকি শারীরিক নির্যাতনও বাদ যাচ্ছে না। এ সকল রক্ষিপুরুষের নৈতিক চরিত্র বলে কিছু ছিল না। তারা যেমন উৎকোচগ্রহণে অভ্যস্ত ছিল, তেমনি মদ্যপানে বিশেষ আসক্ত ছিল। শক্রাবতারবাসী ধীবর রাজার কাছ থেকে অর্থপুরস্কার নিয়ে ফিরে এলে রক্ষিপুরুষেরা তার পুরস্কারের অর্থে ভাগ বসাতে চাইল এবং তাকে সঙ্গে নিয়ে শৌণ্ডিকালয়ে মদ্যপানের মাধ্যমে মিত্রতা স্থাপনে ব্যগ্র হয়ে উঠল।

(১২) **চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড**—সেকালে চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেবার ব্যবস্থা ছিল, এবং সে মৃত্যুদণ্ড নানা বিচিত্র উপায়ে কার্যকর করা হত। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে অপরাধীকে ফুলের মালা পরিয়ে সজ্জিত করা হত। কখনো দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীকে মাটিতে অর্ধেক প্রোথিত করে ক্ষিপ্ত কুকুর অথবা হিংস্র শকুনিকে দিয়ে জীবন্ত ভক্ষণ করিয়ে, অথবা মত্ত হস্তীর পদতলে পিষ্ট করিয়ে, কখনো বা শূলে চড়িয়ে অপরাধীর প্রাণনাশ করা হত।

(১৩) **পুরুষেরও অলংকার ব্যবহার**—কালিদাসের কালে কেবল স্ত্রীলোকেরা অলংকার পরিধান করতেন না, পুরুষেরাও হস্তে বলয়, কর্ণে কুণ্ডল, কণ্ঠে হারলতা, বাহুতে অঙ্গদ ইত্যাদি ধারণ করতেন। এ নাটকের তৃতীয় অংকে দুষ্যন্তের মণিখচিত স্বর্ণবলয় পরিধানের উল্লেখ রয়েছে। "ইদমশিশিরৈরন্তস্তাপাদ্ বিবর্ণমণীকৃতম্.....মণিবন্ধনাৎ কনকবলয়ং স্রস্তং স্রস্তং ময়া প্রতিসার্যতে।" অর্থাৎ জাগরণের শীর্ণতাহেতু অশ্রুপাতে বিবর্ণমণিখচিত স্বর্ণবলয় মণিবন্ধ থেকে পুনঃপুনঃ স্খলিত হয়ে আসে এবং আমার দ্বারা পুনরায় অপসারিত হয়, ইত্যাদি।

(১৪) **স্ববৃত্তির প্রতি মর্যাদাবোধ**—মহাকবি কালিদাসের কালে স্ববৃত্তি অর্থাৎ জাতিগতপেশা, বা স্বধর্মের জন্য মর্যাদা বোধ করত। ধীবরের কাছ থেকে তার জাল, ও বঁড়শি দিয়ে মাছ ধরার পেশার কথা শুনে রক্ষিদ্বয় তাকে উপহাস করলে, সে বলে যে,

Scanned by CamScanner

মানুষ যে বৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সে বৃত্তি নিন্দনীয় হলেও তা' পরিত্যাগ করা উচিত নয়। সে যুক্তি দিয়ে বলে যে, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্বভাবে দয়াপরায়ণ হলেও যজ্ঞীয় পশুবধের সময় নির্দয় হয়ে থাকেন। তা'ছাড়া অনেকে মনে করেন—ধীবরের এ উক্তির মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি সমর্থন রয়েছে।

(১৫) **স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব**—সেকালের সমাজে নারী স্বাতন্ত্র্যের অভাব লক্ষ্য করা যায়। মহর্ষি কণ্ব শকুন্তলাকে পতিগৃহযাত্রাকালে পতিগৃহে আচরণীয় কর্তব্য সম্পর্কে যে সকল উপদেশ দিলেন, তা' থেকে আমরা জানতে পারি যে, স্বামী কোন কারনে স্ত্রীর প্রতি কর্কশ ব্যবহার করলে স্ত্রী তা' অম্লানবদনে সহ্য করতেন, কখনো ক্রোধের বশে স্বামীর বিরুদ্ধাচরণ করতেন না। সতী হলেও বিবাহিতা নারী পিতৃগৃহে বেশীদিন অবস্থান করলে সমাজে তার সম্পর্কে নানাপ্রকার কুৎসা রটনা হত। সেকারণে পতি প্রিয় হোক্ বা অপ্রিয় হোক্, পত্নীর সর্বদা পতিসান্নিধ্যে থাকাই অভিপ্রেত ছিল। তাছাড়া, পত্নীর উপর পতির প্রভুত্ব ছিল সর্বতোমুখী।

(১৬) **বিচার ব্যবস্থা**—সেকালে বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাজাই ছিলেন সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী। তিনি নিজে বিচারকার্য দেখতেন, তবে বিশেষ প্রয়োজনে অমাত্যের হাতে বিচারের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হত। রক্ষিপুরুষেরা সন্দেহভাজন অপরাধীকে বন্দী করে রাজার কাছে বিচারের জন্য নিয়ে আসত। পথে তারা অপরাধীদের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের জন্য নানাপ্রকার অত্যাচার, উৎপীড়ন করত, এবং সর্বদা তাদের বিচিত্র উপায়ে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখাত। বিচারের অপরাধীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হতো না। চুরির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। উত্তরাধিকার আইন অনুসারে পত্নীর গর্ভস্থ সন্তানও মৃতপিতার সম্পদের উত্তরাধিকারী হত।

Scanned by CamScanner

অনিলচন্দ্র বসু সম্পাদিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম ' গ্রন্থ থেকে ছাত্র- ছাত্রীদের কিছু তথ্য দিতে পেরে আমি মাননীয় সম্পাদক অনিলচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ধন্যবাদান্তে

দিলরুবা খন্দকার

সংস্কৃত বিভাগ

দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়।

Scanned by CamScanner